নীল টিয়া

দীপান্বিতা রায়

পুনশ্চ

সূচিপত্র

মোহরের ঘড়া	৯
দুগগা মেঝেন	১৮
ব্যান্ডমাস্টার	২৩
নীল টিয়া	২৭
মন কেমন	৪১
আলোর ঠিকানা	৪৭
অমৃতের পুত্র	৬০
আলোর বীজ	৬৮
হিয়ার ঠামু	৭৮
স্লেজগাড়িতে লক্ষ্মীমাসি	৮৩
ফিনিশিং টেপ	৮৯
আশ্চর্য চুরি	৯৭

॥ মোহরের ঘড়া ॥

পর্দার ফাঁক দিয়ে এক টুকরো সূর্যের আলো এসে চোখে পড়তেই চট করে ঘুমটা ভেঙে গেল তকাইয়ের। বিছানায় উঠে বসে দেখল পাশের খাটে মজারু চাদর মুড়ি দিয়ে অঘোর ঘুমে। বোনকে না ডেকে, মশারি তুলে সুড়ুত করে বেরিয়ে এসে, চপ্পলটা পায়ে গলিয়েই একবারে এক দৌড়ে বাগানে। ঠিক যা ভেবেছে তাই। বাবা উঠে পড়েছে আগেই। ব্যায়ামও করা হয়ে গেছে। অন্যদিন তকাই আর মজারুও ব্যায়াম করে বাবার সঙ্গে। কিন্তু আজ রবিবার বলে ভাই-বোনের ছুটি। তকাইকে দেখেই বাবা হেসে বলল, উঠে পড়েছিস। চল তাহলে এক পক্কড় ঘুরে আসি। ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে সুন্দর। মজারুকেও ডেকে নিয়ে আয়।

বোন তো ঘুমোচ্ছে এখনও।

তুলে দে। সূর্য্যি উঠে গেলে আর ছোটো ছেলেপুলেদের ঘুমোতে নেই। তাছাড়া ঘুম থেকে উঠে যদি দ্যাখে আমরা নেই, তাহলে অমনি তোর মায়ের কাছে গিয়ে ঢুকবে।

মা-কে রোজ সকাল সকাল উঠে অফিস যেতে হয়। ফিরতেও রাত হয় বেশ। রবিবারটা তাই মায়ের বিশ্রামের দিন। তকাই সেটা খুব ভালো করে জানে। মজারুও জানে। তবে ও তো ছোটো তাই গণ্ডগোল করে ফেলতেই পারে। তাছাড়া তকাই একলা একলা বাবার সঙ্গে বেড়াতে চলে গেছে শুনলে কান্নাও জুড়ে দিতে পারে। বড়ো দাদা হয়ে তার উচিত নয় এমন সব বেয়াক্কেলে ব্যাপার-স্যাপার হতে দেওয়া। তাই খুব বেশি ইচ্ছে না থাকলেও বাবার কথামতো তকাই চলে যায় বোনকে ডাকতে।

সকাল সকাল বাবার এই এক পক্কড় ঘুরতে যাওয়া কথাটার মানে অবশ্য তকাইয়ের জানা। মোটামুটি চওড়া একটা বাঁধানো রাস্তার ধারে তাদের বাড়ি। সেই রাস্তাটার একদিক দিয়ে মিশেছে বড়ো শহরে যাওয়ার বিশাল চওড়া সাপের পিঠের মতো চকচকে কালো হাইওয়েতে। প্রতিদিন ওই পথেই বাসে চেপে স্কুলে যায় তকাই আর মজারু। মা-এর অফিসের গাড়িও ওই রাস্তা দিয়ে আসে। বাবার কলেজটা অবশ্য অন্যদিকে। বাড়ির সামনের পিচ ঢালা রাস্তাটা ধরে বেশ কিছুটা গেলেই ডাইনে-বাঁয়ে সরু সরু পথ বেরিয়ে যায়। তার মধ্যে ঠিক কোনটা ধরে এগোলে যে বাবার কলেজে পৌঁছানো যাবে সেটা তকাই এখনও ঠিক ঠাওর করতে পারে না।

পিচের রাস্তাটা কিন্তু তাদের বাড়ি ছাড়িয়ে আরও বেশ কিছুটা গিয়ে একটা লাল মোরামের পথে মিশে গেছে। সেই কুরকুরে মোরাম ধরে কিছুটা হাঁটলেই মংলুদের গ্রাম। তকাই জানে বাবা সেদিকে যাবে না। বাবার পছন্দ তার অনেক আগে সোনাঝুরি জঙ্গলের ভিতর দিয়ে এঁকে বেঁকে এগিয়ে যাওয়া একটা সরু পায়ে চলা পথ। সোনাঝুরির বনটা শেষ হয়ে যায় খুব তাড়াতাড়ি। তারপরেই শুরু হয় শালবন। লম্বা লম্বা শালগাছগুলো মাথা উঁচু করে সিধে দাঁড়িয়ে থাকে। শুকনো পাতা হাওয়ায় ঘুরে ঘুরে খসে পড়ে মাটিতে। খুরখুর করে কাঠবিড়ালি ছুটে বেড়ায়। সবমিলিয়ে জঙ্গলটা একটা দারুণ ইন্টারেস্টিং জায়গা। তকাই আর মজারু দুজনেই বাবার সঙ্গে আগেও দু-একবার জঙ্গলে গেছে। একবার তো মাও সঙ্গে গেছিল। কিন্তু এবার যাওয়ার একটা আলাদা আকর্ষণ আছে। বাবা বলেছে বসন্তকাল শুরু হয়ে গেছে। শালগাছে তাই এখন ফুল ফুটছে। জঙ্গলে ঢুকলেই নাকি শালফুলের মিষ্টি গন্ধ নাকে আসবে। আর গাছের নীচে খুদি খুদি ঢিপি হয়ে পড়ে থাকবে ফুলের পাপড়ি আর রেণু। ফুঁ দিয়ে সেগুলো ওড়াতে দারুণ মজা। শোনার পর থেকে তকাইয়ের আর তর সইছে না।

পুরুলিয়ার কাছে এই ছোট্ট জায়গাটায় তকাইদের আসা প্রায় এক বছর হতে চলল। কিন্তু তবু এখনও জায়গাটাকে যেন নতুন লাগে তকাইয়ের। প্রতিদিন উঠে মনে হয় যেন নতুন কিছু একটা আবিষ্কার করে ফেলবে। নতুন একটা গাছ কিংবা ফুল রাস্তার ধারে পড়ে থাকা অদ্ভুত একটা রঙিন পাথর। একা মংলুই তো তাকে কত নতুন জিনিস চিনিয়েছে। আসলে এর আগে কলকাতায় তারা যেখানে থাকত তার থেকে এই জায়গাটা এত আলাদা যে তকাই এখনও কেমন যেন একটা নতুনের গন্ধে ডুবে থাকে। মজারুটা ছোটো বলে অত কিছু বলতে পারে না কিন্তু তারও যে ভারি ভালো লাগে সেটা বেশ বোঝা যায়।

কলকাতায় তকাই আর মজারু মায়ের সঙ্গে থাকত তাদের দাদুর বাড়িতে। শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ের কাছেই বিশাল তিনতলা বাড়ি। প্রত্যেক তলায় আধখানা চাঁদের মতো থাম দেওয়া মস্ত বারান্দা। নীচের রাস্তা দিয়ে সারাদিন বাস, ট্রাম, ট্যাক্সি, ঠেলা কত কী যে চলছে তার কোনো ইয়ত্তা নেই। আকাশ ফরসা হওয়ার আগেই ট্রামের টঙটঙ ঘন্টি শোনা যায়। তারপরেই শুরু হয়ে যায় চেঁচামেঁচি, হাঁকাহাঁকি, শোরগোল। রাতে তকাইরা ঘুমিয়ে পড়ার সময়ও পাড়া শান্ত হয় না। কতদিন তকাই একঘুম দিয়ে জল খেতে উঠে দেখেছে, তখনও রাস্তা দিয়ে লোকজন চলাচল করছে। পানের দোকানের বিক্রি-বাটা বন্ধ হয়নি। হ্যালোজেনের আলোয় চারদিক ফটফটে, দিন না রাত বোঝা কঠিন।

শ্যামবাজারে থাকার সময়ও মা বেশ সকাল সকালই অফিসে বেরিয়ে যেত। তার একটু পরে তাদের দুই ভাই-বোনকে দাদু স্কুলের বাসে তুলে দিত। আবার ছুটির সময় নামিয়েও আনত। মা ফিরত সন্ধে পেরিয়ে। পুরুলিয়ার কলেজে বাবার পড়ানোর চাকরি। শনি-রবি ছুটি। শুক্রবার রাতের ট্রেনে বাবা আসত কলকাতায়। ছুটির দিনগুলো তাই বাবার সঙ্গে ভারি মজায় কাটত। সোমবার হতেই মনখারাপ। বাবা ফিরে যাবে। সারা সপ্তাহ থাকতে হবে বাবাকে ছেড়ে। মা নাকি চেষ্টা করছিল অনেকদিন ধরেই শেষপর্যন্ত ট্রান্সফারের ব্যবস্থা হতেই তাদের দুই-ভাই বোনকে নিয়ে চলে এল এখানে। দাদু-দিদার একটু মন খারাপ হয়েছিল।

কিন্তু মা বলল, ব্যাংক থেকে মস্ত বাংলো দিয়েছে থাকার জন্য। চার-পাঁচটা ঘর। বিশাল বাগান। তোমরাও চলে এসো মাঝে মাঝেই। অমন সুন্দর জায়গা। সবাই মিলে হইচই করে থাকা যাবে।

বাবা এবার থেকে ওদের সঙ্গেই থাকবে জেনে তকাই আর মজারু তো আহ্লাদে আটখানা। মা অবশ্য ঠিকই বলেছিল। তাদের বাড়িটা সত্যিই বিশাল বড়ো। অনেকগুলো ঘর। সামনে লন দেওয়া ফুলের বাগান। পিছনে সবজির চারা লাগানো হয়েছে। বাংলোর হাতার মধ্যেই দুটো মস্ত জাম, একটা জামরুল আর গোটা দুয়েক পেয়ারা গাছ আছে। তবে এতসব কিছুর মধ্যেও তকাইয়ের সব থেকে মজাদার লাগে ইঁদারাটা। বাড়ির একদম পিছন দিকে পাঁচিলের ধার ঘেঁষে আছে ইঁদারা। খুব গভীর। নীচু হয়ে থাকলে অনেক নীচে কালো জলের ওপর মুখের ছায়া দুলে দুলে ওঠে। হো করে শব্দ করলে সেই আওয়াজ ইটের গায়ে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে। ভয় ভয় লাগে তকাইয়ের। আবার ভালও লাগে খুব।

আসলে এই জায়গাটায় জলের বেশ কষ্ট। বিশেষ করে গরমকালে কলে জল পড়ে সুতোর মতো সরু ধারায়। তখন ইঁদারার জলে কাজকর্ম চলে। খুব গভীর বলে শুকোয় না কখনও। অনেক সময় পাড়া-পড়শিরাও এখান থেকে জল নিতে আসে। আর কটকটে গরমের দুপুরে খালি গায়ে সে যখন ইঁদারার পাশে এসে দাঁড়ায় আর বাবা হুড়হুড় করে ঠান্ডা জল গায়ে ঢেলে দেয়, তখন সে যে কী আরাম।

জল যে আবার হিসেব করে খরচা করতে হয়, বাথরুমের মেঝেতে ইচ্ছে হলেই হুড়মুড় করে বালতি উপুড় করতে নেই, এমন কথা কলকাতায় থাকতে কখনও ভাবেইনি তকাই। দাদুর বাড়ির সামনে একটা চাপাটা কলের মতো জিনিস ছিল। তার থেকে সারাদিন হদহদ করে জল পড়ছে। গুচ্ছের লোক সাবান মেখে চান করছে, কাপড় কাচছে। কল বন্ধ করার কোনো ব্যাপারই নেই। কথাটা একদিন বাবাকে বলাতে বাবা বলল,

কলকাতার কাছেই তো গঙ্গা নদী, তাতে অনেক জল। তাই জলের কষ্ট নেই। এখানে যে বড়ো নদী থেকে জল আসে সেটা অনেক দূর। নদীও মাত্র একটা, তার থেকেই অনেকগুলো জায়গায় জল দিতে হয়। তাই জলের এমন টানাটানি।

নদীর কথা বলতে গিয়ে একটা আশ্চর্য গল্পও বলেছিল বাবা। অনেক বছর আগে এই জায়গাটা দিয়ে আর একটা নদী নাকি বয়ে যেত। কিন্তু সেটা হারিয়ে গেছে। অনেক সময় নদী আপনা থেকেই তার রাস্তা পালটে অনেক দূরে সরে যায়। নতুন জায়গায় গিয়ে তার নতুন নাম হয়। তখন সেই পুরোনো নদীটাকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। অনেক সময় আবার জলের অভাবে নদী শুকিয়ে যায়। শুকনো বালিভরা খাতটা পড়ে থাকে অনেকদিন। তারপর আস্তে আস্তে তাতে ঘাস গজায়, আগাছা জন্মায়। তখন আর সেটাকে নদীখাত বলে চেনা যায় না। কিন্তু সেই শুকনো নদীর বুকের অনেক ভিতরে অনেকসময়ই চুপচাপ বয়ে যায় ক্ষীণ জলের ধারা। তাকে চিনতে পারা কিংবা খুঁজে পাওয়া দুই-ই খুব কঠিন। বাবার কাছে গল্পটা শোনার পর থেকে তকাই ভারি খুশি হয়ে বলে উঠেছিল,

আমি জানি বাবা, ওই নদীটা কোথায় আছে।

সেকি রে। তুই জানলি কী করে?

আরে তুমি বুঝতে পারছ না, নদীটা নির্ঘাত গিয়ে আমাদের ইঁদারাটার ভিতরে সেঁধিয়েছে, সেইজন্যই তো ওর জল কখনও শুকোয় না।

তকাইয়ের কথা শুনে সেদিন বাবা এমন হো হো করে হেসে উঠেছিল যে রাগ হয়ে গেছিল তার। নদীর গল্পটা মংলুকেও বলেছিল তকাই। মংলু কিন্তু বিশ্বাস করেনি। মংলুর বুড়ো দাদা, যার নাকি এত বয়স যে গোটা মুখটাই কাটাকুটি খেলার মতো দাগে ভরতি, মাথার সব চুল বিলকুল সাদা আর পা-দুটো একটু নড়বড়ে মতো, সে এই শালপুরা এলাকাটা হাতের পাতার মতো চেনে। কিন্তু তার কাছেও মংলু কোনোদিন এমন কোনো হারিয়ে যাওয়া নদীর গল্প শোনেনি।

মংলুর কথা ভাবতে গিয়েই তকাইয়ের মনে হল,

আরে আজ এত বেলা হয়ে গেল এখনও তো মংলু আসেনি। পুতলিমাসি কাজে চলে এসেছে অনেকক্ষণ।

এমনিতেই তকাইদের স্কুল ছুটি থাকলে মংলু সকালেই পুতলিমাসির সঙ্গে তাদের বাড়ি চলে আসে। দুপুরে এখানে মাসির সঙ্গে ভাত খায়। তারপর একেবারে বিকেলের খেলা সেরে বাড়ি যায়। তকাইদের সঙ্গেই কলকাতা থেকে এখানে এসেছে কমলাপিসি। তাকে মায়ের বলা আছে, মংলু আসলে যেন পেট ভরে খাইয়ে তবে বাড়ি পাঠায়।

আসলে মংলুর তো ওই বুড়ো দাদা ছাড়া আর কেউ নেই। মা-বাবা দুজনেই নাকি কী একটা অসুখ হয়ে মরে গেছে। তাও দাদা যতদিন শক্ত ছিল এদিক-ওদিক কাজ করে যা টাকা-পয়সা পেত, তাই দিয়ে দুজনের পেট চলত কোনোরকমে। কিন্তু চোখে ছানি পড়ে যাওয়ায় মংলুর দাদা এখন আর ভালো দেখতে পায় না। কাজও তাই তেমন জোটে না। সেজন্য মংলুদের অনেক সময়ই আধপেটা খেয়ে থাকতে হয়। স্কুল খোলা থাকলে মিড-ডে মিলে একবেলা ভরপেট খাওয়া যায়। কিন্তু ছুটির দিনটায় তো খুব কষ্ট। কমলাপিসি তাই ফি রবিবারেই মংলুকে পেট ভরে খাইয়ে, ঠাকুরদার জন্যও কিছুমিছু পোঁটলায় বেঁধে দিয়ে দেয়।

কিন্তু মংলু যদি না আসে তাহলে ছুটির দিনে তকাই খেলবে কার সঙ্গে? শালপুরা জায়গাটা ভারি সুন্দর হলেও একটু ফাঁকা ফাঁকা। আর তকাইদের মতো ছোটো ছেলেপিলে মোটে নেই। স্কুলের বন্ধুরা তো সব অনেক দূরে দূরে থাকে। মজারুটা এত পুঁচকি যে তার সঙ্গে বেশিক্ষণ খেলাই যায় না। তাই প্রথম যেদিন মংলু পুতলিমাসির সঙ্গে তাদের বাড়িতে এল, সেদিন থেকেই তার সঙ্গে একেবারে গলায় গলায় ভাব হয়ে গেছে তকাইয়ের। আর ভাব হবে নাই বা কেন? এমন সব খেলা জানে মংলু যার কখনও নামই শোনেনি তকাই। গুলতি ছুড়ে কাক মারতে পারে। কত রকম গাছ আর পাখি চেনে। মাটি খুঁড়ে পিঁপড়ের ডিম তুলে নিয়ে আসতে পারে।

তকাই আর মজারু দুজনেরই দুটো ছোটো বাইসাইকেল আছে। মাত্র দুদিনে সেই সাইকেলটা চালাতে শিখে নিয়েছিল মংলু। তারপর থেকে কখনও মজারুকে ডবল ক্যারি করে কখনও তারা দুজনে সাইকেল চালিয়ে মংলুদের গ্রামে যেতে বড্ড ভালো লাগে তকাইয়ের। কেমন সব পরিষ্কার ঝকঝকে মাটির বাড়ি। খড়ের চাল দেওয়া, দেওয়ালে ছবি আঁকা। মুরগি পোষে অনেকেই। ছোটো ছোটো হলুদ হলুদ বলের মতো মুরগিছানাগুলো তুরতুর করে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ায়। হালকা গোলাপি

শুয়োর ছানারা কালো কুচ্ছিত মায়ের পেটের কাছে শুয়ে আরাম করে দুধ খায়। মজারুর খুব ইচ্ছে ছিল একটা শুয়োর ছানা বাড়িতে নিয়ে এসে পোষে। কিন্তু মা কিছুতেই রাজি হয়নি।

পুতলিমাসির কাছেও মংলুর কোনো খবর পাওয়া গেল না। সকালে তাদের বাড়িতে আসার সময় সে নাকি মংলুকে দেখতে পায়নি। সারা সকাল এল না মংলু। দুপুরের রোদ একটু ঢলতেই তকাই তাই সাইকেল নিয়ে সোজা হাজির হল বন্ধুর বাড়িতে। দাওয়ায় একটা মাদুর পেতে তার ওপর শুয়ে আছে মংলু। আগের দিন রাত থেকে জ্বর এসেছে খুব। বুড়ো দাদা চুপ করে বসে

আছে মাথার পাশে। তকাইকে দেখে খুশি হয়ে উঠে বসার চেষ্টা করল মংলু। কিন্তু পারল না। শরীরটা খারাপ। তাই শুয়ে পড়ল আবার। তকাইদের জ্বর হলে বাবা ওষুধ দেয়। বুড়ো দাদা কিন্তু মংলুকে ওষুধ দেয়নি। তার বদলে জলপড়া এনে খাইয়েছে। ওদের জানগুরু বলেছে এতেই ভালো হয়ে যাবে মংলু।

ভালো কিন্তু হল না। তিন-চারদিন কেটে গেল। ধুম জ্বর। তার সঙ্গে আবার পেটেও খুব ব্যথা। মাত্র কয়েকদিনেই রোগা হয়ে যেন কাঁথার সঙ্গে মিশে গেছে মংলু। কী করবে কিছুই ভেবে পাচ্ছে না তকাই। মায়ের অফিসে খুব কাজের চাপ। ইয়ার এন্ডিং চলছে। সকালে বেরিয়ে অনেক রাতে বাড়ি ফিরছে মা। অত রাত পর্যন্ত জেগে থাকতে পারে না তকাই। এদিকে বাবা

আবার কলেজের ছেলে-মেয়েদের নিয়ে দশ দিনের জন্য এক্সকারশনে নৈনিতাল গেছে। তাই মংলুর এই অসুখের খবরটা নিয়ে মা-বাবা কারুর সঙ্গে আলোচনা করা যাচ্ছে না। মজারু অবশ্য সারাক্ষণই তার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে। কিন্তু তার আর কতটুকুই বা বুদ্ধি।

সেদিন বিকেলে মংলুদের বাড়িতে গিয়ে তকাই শুনল, অনেক কষ্টে অল্প কিছু টাকা-পয়সা জোগাড় করে বুড়ো দাদা নাকি মংলুকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে গেছিল। ডাক্তার বলেছে মংলুর পেটে পাথর পড়েছে। পেট কাটতে হবে। অনেক টাকা লাগবে। দাদার কাছে অত টাকা ছিল না। তাই তারা বাড়ি ফিরে এসেছে। খবর পেয়ে জানগুরুও এসেছিল। ডাক্তারের কথা শুনে খুব ভয় পেয়ে গেছে মংলু। ভয়ে তার চোখের পাতা তিরতির করে কাঁপছে। রোগা গাল বেয়ে গড়িয়ে আসছে জলের ধারা। ভয় পেয়েছে বুড়ো দাদাও। দু-হাঁটুর মধ্যে মুখটি গুঁজে বসে আছে চুপ করে। বন্ধুকে সান্ত্বনা দিয়ে তকাই বলে, ভয় পাস না। ডাক্তার তো বলেছে পেট কাটলে ঠিক হয়ে যাবে। ওকে অপারেশন বলে, আমি জানি। দিদার হয়েছিল।

কিন্তু পেট কাটতে তো টাকা নেবে ডাগদর। টাকা কোথায় পাব?

মংলুর কথা শুনে ভারি অসহায় বোধ করে তকাই। তার কাছে তো টাকা নেই। মা-বাবা কেউ টাকা হাতে দেয় না। চাইলে বলে, কী কিনবে বলো, কিনে দিচ্ছি। মজারুর একটা পিগি ব্যাংক আছে। কিন্তু সেটাও মায়ের আলমারিতে বন্ধ থাকে।

এক জায়গায় অনেক টাকা আছে আমি জানি...

মংলুর কথা শুনে চমকে ওঠে তকাই,

কোথায় রে?

আমাদের গ্রামটা ছাড়িয়ে মাঠের ভিতর দিয়ে পুব দিকে অনেকটা যেতে হবে। মস্ত উঁচু একটা টিপি। ওই টিপির নীচে রাজবাড়ি ছিল। এখনও অনেক সোনা-দানা, মোহর মাটির নীচে পোঁতা আছে। দাদা আমাকে গল্প বলেছে। দাদা জানে।

মাটিতে পোঁতা আছে অথচ কেউ তুলে নেয়নি?

কী করে নেবে? ওখানে তো কেউ যায় না। ওখানে নাকি অপদেবতারা ঘুরে বেড়ায়। জ্যান্ত মানুষ দেখলেই তার ঘাড় মটকে দেয়।

আমি অপদেবতায় ভয় পাই না। বাবা বলেছে ভূত বলে কিছু হয় না। আমি যাব ওখান থেকে গুপ্তধন আনতে। একঘড়া মোহর পেলে ডাক্তারবাবু তোর অপারেশন করে দেবে তো?

খুশি হয়ে ঘাড় নাড়ে মংলু,

আমিও তোমার সঙ্গে যাব দাদা...

বিরক্ত হয় তকাই,

তুই কোথায় যাবি? পুঁচকে মেয়েদের ওরকম যেখানে-সেখানে যেতে নেই।

তাহলে মা-কে বলে দেব, তুমি মংলুদাদার জন্য গুপ্তধন খুঁজতে যাচ্ছ।

মজারুর বদবুদ্ধি দেখে রাগে মাথা গরম হয়ে যায় তকাইয়ের। কিন্তু কিছু করার নেই। মা-কে একটু ভয়ই পায় তকাই। একবার যদি না বলে দেয়, তাহলে সব প্ল্যান ভেস্তে যাবে। আর এখানে তো মংলুকে বাঁচিয়ে তোলার মতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। গণ্ডগোল হলে খুব বিপদ। তাই বাধ্য হয়েই ঘাড় নাড়ে তকাই,

ঠিক আছে যাবি। কিন্তু ভূত দেখে যদি ভয় পেয়েছিস আর ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কেঁদেছিস, তাহলে দেখিয়ে দেব মজা।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে তকাই ঠিক করে ফেলল গুপ্তধন উদ্ধারের ব্যাপারটা আজই সেরে ফেলবে। পরীক্ষা হয়ে গেছে বলে স্কুলে এখন কয়েকদিন ছুটি। মায়ের অফিস থেকে ফিরতে সন্ধে পেরিয়ে যায়। পড়াশোনা নেই বলে তারা দুজনে বিকেল না হতেই খেলতে বেরোলে কমলাপিসি কিছু বলে না। তার মানে মা ফিরে আসার আগে অনেকটা সময় পাওয়া যাবে। তারমধ্যেই কাজটা সেরে নেবে। বাবা থাকলে একটু মুশকিল হয়ে যায়। কারণ ক্লাস না থাকলে বাবা